রবীন্দ্রনাথ : শেষ বছরের ছবি

মৃণাল ঘোষ

'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ করি/ বিচিত্র ছলনাজালে/ হে ছলনাময়ী!' –আমরা সবাই জানি, এটি রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা। লিখেছিলেন বলা ভুল। মুখে মুখে বলেছিলেন। অন্য কেউ লিখে নিয়েছিল। ৩০ জুলাই ১৯৪১ তারিখে সকাল সাড়ে ন'টায়। এর পরই তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। তারপর আর জ্ঞান ফেরেনি। এটিকে বলা যায় তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। শরীর তখন অশক্ত রোগজর্জর। কিন্তু চৈতন্য কতটা সজীব, এই কবিতাটি আমাদের তা বুঝতে সাহায্য করে। এর শেষ তিনটি লাইন আমরা আর একবার পড়ি। 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/ সে পায় তোমার হাতে/ শান্তির অক্ষয় অধিকার।' নানা দ্বন্দ্ব-সংকটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাঁর চেতনা শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসে এসে লিখেছিলেন– 'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন'। এই তপস্যার পথে যত ঝঞ্ঝাই আসুক, বিশ্বাসে স্থিত থাকাই জীবনের প্রধান দায়। ১৯৪১ -এর ১৪ এপ্রিল নববর্ষের শেষ ভাষণ দিয়েছিলেন : 'সভ্যতার সংকট'। পশ্চিমী সভ্যতার যে আলোকদীপ্তির উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন জীবনের প্রথম পর্বে শেষ পর্যায়ে এসে দেউলে হয়ে গেছে সেই আস্থা। এই নিবিড় নাস্তির মধ্যেও তিনি শেষ পর্যন্ত মানুষের উপর বিশ্বাস হারাতে চান নি।

এই বিশ্বাসের জায়গাটিই নানাভাবে প্রতিভাত হয় তাঁর শেষ এক বছরের ছবিতে। রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনই ছবি ভালবেসেছেন। শুরু থেকে আমাদের আধুনিক চিত্রকলার বিবর্তনপথের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থেকেছেন। কখনো কখনো নিজে কিছু কিছু চর্চাও করেছেন। সেগুলি নিছকই অনুশীলনমূলক। ১৯২৩ এর আগে তিনি পরিপূর্ণভাবে নিজেকে ছবিতে নিমগ্ন করেন নি। ১৯২৩ -এ 'রক্তকরবী'র পাণ্ডুলিপি কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে তাঁর ছবি আঁকার সূচনা। ১৯২৪ -এ 'পূরবী'-র পাণ্ডুলিপিতে ভুল সংশোধনের অছিলায় জেগে উঠতে থাকে এ স্বতন্ত্র গোত্রের ছবি। আমাদের দেশে তো বটেই সমগ্র বিশ্বশিল্পের ইতিহাসেও এর তুলনা বিরল। তারপর ১৯২৮ থেকে শুরু হয় পরিপূর্ণ ধারায় তাঁর চিত্রসৃষ্টি। শেষ ছবিটি এঁকেছিলেন সম্ভবত ১৫ জুন ১৯৪১ তারিখে (১ আষাঢ় ১৩৪৮)। এর মধ্যে তিনি এঁকে ফেলেছিলেন প্রায় ২৩০০ ছবি।

রবীন্দ্রনাথের ছবি, আমরা জানি, ভারতীয় চিত্রকলার আধুনিকতার ধারায় এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। তিনিই আমাদের প্রথম আধুনিকতাবাদী শিল্পী। আধুনিকতার অন্তর্লীন সংকট থেকে, শিল্পীর আত্মগত বোধ থেকে, কখনো বা মগ্নচেতনার আলো-আঁধারি থেকে জেগে ওঠে যে অবিনব রূপ, আধুনিকতার বিবর্তনে যার কোনো পূর্বদৃষ্টান্ত থাকে না, তাকেই বলা যেতে পারে মডার্নিস্ট বা আধুনিকতাবাদী ধারা। পাশ্চাত্যে ১৯০৫ -এ এক্সপ্রেশনিজম, ১৯০৭ -এ কিউবিজমের যে সূচনা হয়েছিল, সেটা আধুনিকতাবাদী ধারার অন্তর্গত। ইম্প্রেশনিজম উত্তর আধুনিকতার ধারায় এটা ছিল এক নতুন চেতনার উন্মেষ, যাতে কেবলই বিশ্লেষিত হয়েছে সভ্যতার সংকট। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিকতাবাদের প্রথম প্রবক্তা।

যে নতুন আঙ্গিকের প্রবর্তন করলেন তিনি, তা আপাতভাবে প্রধানত দুটি উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে। একটি পাশ্চাত্যের অভিব্যক্তিবাদ বা এক্সপ্রেশনিজম। আর একটি যে উৎস থেকে জেগে উঠেছিল এক্সপ্রেশনিজম, সেই আদিমতার নিবিড় অন্তর্মুখীনতা। বিংশ শতকের প্রথম পর্যায় থেকে আদিমতা পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। আদিমতার শিল্পে যে সংহত শক্তির প্রকাশ থাকে, যে অস্তিত্বের গভীর সংকট, আধুনিকতার পক্ষে সেই শক্তিকে কাজে লাগানো খুবই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এই শক্তি ও সংকটেরই নানা বিবর্তন দেখি আমরা এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজম, ডাডাইজম, ফিউচারিজম, সুররিয়ালিজম ইত্যাদি নানা আন্দোলনে।

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে রবীনত্মরনাথ যখন বিস্তৃত ভ্রমণ করেছেন এবং ইউরোপীয় শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে যখন তাঁর সংযোগ ঘটেছে, তখন আদিমতার নানা উৎসের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় হয়েছে। জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে ৬৩-৬৪ বছর বয়সে যখন তিনি শুরু করলেন ছবি আঁকা, তখন অস্তিত্বের নানা বাস্তব ও আধ্যাত্মিক সংকটও তাঁর চেতনার গভীরে ছায়া ফেলেছে। সেই সংকটকে ছবি অভিব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি যে অভিনব রূপের সন্ধান করেছিলেন, তা তিনি পেয়ে গেলেন আদিমতার মধ্যে। আদিমতার সংহত শক্তিকে তিনি ব্যবহার করলেন রূপের নির্মাণে। কিউবিজম তাঁকে ততটা আকৃষ্ট করে নি। যদিও প্রথম পর্যায়ের ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ -এর মধ্যে করা অনেক ছবিতে ঋজু ও কৌনিক জ্যামিতি তিনি ব্যবহার করেছেন। অভিব্যক্তিবাদী যে অন্তর্মুখীনতা, তাই হয়ে উঠেছে ছবিতে তাঁর প্রকাশের প্রধান ভিত্তি। কল্পরূপ বা ফ্যানটাসি, সুররিয়ালিজম এমনকি বিমূর্ততার ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে প্রথম পথিকৃৎ তিনি।

এ থেকে মনে হতে পারে, পাশ্চাত্যই বুঝি রবীন্দ্রনাথের ছবির একমাত্র উৎসভূমি। এ কথা একেবারেই ঠিক নয়। সারা জীবন তাঁর চেতনা যে দেশজ ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে, যেখানে অধ্যাত্মচেতনা ও ঔপনিষদিক ভাবধারা থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন অপরিমিত আলো, ছবির ক্ষেত্রে এসে সেটা অবাস্তব হয়ে যায় নি। বরং স্বদেশের এই ঐতিহ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংকট ও নানা ভাবধারার এক নিবিড় সংশ্লেষ ঘটেছে। সেই সংশ্লেষ থেকেই জেগে ঠেছে তাঁর ছবি। তাই তাঁর ছবিতে তীব্র অন্ধকার যেমন আছে, তেমনি আছে এক হিরণ্ময় আলো এই আলো-আঁধারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তিনি জীবনকে দেখেছেন। 'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন'–এই বোধ যেমন সারা জীবন তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হয়েছে, তেমনি বিশ্বাসের এক আলোকিত প্রজ্ঞাও কাজ করেছে। তাঁর ছবির ভিতর এই দুইয়ের এক সুষম সমন্বয় ঘটেছে, যে তা হয়ে উঠেছে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার নিবিড় বুননে সমৃদ্ধ অভিনব রূপের উৎসারণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ পনের বছর প্রায় স্বপ্নতাড়িতের মতো অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছবি এঁকে গেছেন। তাঁর প্রায় ২৩০০ ছবির মধ্যে কিছু ছবি নানা দিকে ছড়িয়ে গেছে। দেশে বিদেশে নানা ব্যক্তিগত সংগ্রহে হয়তো রয়েছে। তবে বিশ্বভারতী ও প্রতিক্ষণ প্রকাশন -এর যৌথ উদ্যোগে চারখন্ডে 'রবীন্দ্র চিত্রাবলী' প্রকাশের পর তাঁর ছবির একটি বড় অংশ এখন আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। 'চিত্রাবলী' -তে মুদ্রিত হয়েছে মোট ২০৬৩টি ছবি। যে ছবি এখানে ছাপা হয় নি তার মধ্যে রয়েছে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্ট সংগ্রহের ৩৭টি, স্টেলা ক্রামরিশ

সংগ্রহের ৯টি, এল্‌মহার্স্ট-কে উপহার দেওয়া লন্ডনের ডার্টিংটন হল সংগ্রহের ১১টি। এই নিয়ে মোট ২১২০। বাকি ১১৮০টি ছবি এখন আর আমাদের দেখার সুযোগ নেই। আমরা 'চিত্রাবলী' তে-মুদ্রিত ২০৬৩টি ছবির ভিতর থেকে তাঁর শেষ এক বছরের আঁকা ছবির একটা হিসেব পেতে পারি। 'চিত্রাবলী - তে ছবি ছাপা হয়েছে কালানুক্রমিকভাবে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে। সেই পর্যায়গুলি বিষয়ভিত্তিক। প্রথম খন্ডে রয়েছে ডুড্‌লস ও কম্পোজিশন। দ্বিতীয় খন্ডে মুখোশ ও মুখ এবং পোর্ট্রেটস/ক্যারেকটার্স। তৃতীয় খন্ডে ফিগার্স, জেসচার্জ এবং মোটিফস/ মোমেন্টস। চতুর্থ খন্ডে নিসর্গ ও পুল এবং ড্রয়িং ও ইলাস্ট্রেশন। শেষ এক বছর বলতে আমরা ১৯৪০ ও ১৯৪১ সাল ধরব। প্রতিটি বিভাগে এই এক বছর যে ছবিগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলিকে আমরা একটু নিবিষ্টভাবে দেখব।

'চিত্রাবলীর' অন্তর্গত ২০৬৩ -টি ছবির মধ্যে ১৯৪০ -৪১ -এ আঁকা ছবির সংখা ৬৫টি। অর্থাৎ জীবনের শেষ এক বছর সাত মাসে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন এই ৬৫টি ছবি। এই সংখ্যাটি যে সঠিক, তা হয়তো নয়। আরও কিছু এঁকে থাকতে পারবেন, যার হদিশ এখন আর পাওয় যায় না। তা আর হিসেবের মধ্যে নেই। তবে ২০৬৩ -র বিপরীতে ৬৫-এই অনুপাতটি ধরে আমরা বুঝাতে পারি এই শেষ পর্যায়ে তাঁর ছবির সংখ্যা কমে আসছিল। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত যে বিপুল বেগে চলছিল ছবি আঁকা, সেটা একটু শ্লথ হয়েছিল। হয়তো শারীরিক কারণে। হয়তো অন্যান্য কাজের চাপে। এই ৬৫টি ছবিকে বিষয়ের দিক থেকে ভাগ করে দেখলে, বিন্যাসটি দাঁড়ায় এরকম। কাটাকুটির ছবি বা ডুড্‌লস এঁকেছিলেন ৩টি। মানুষ বা প্রাণীর বিভিন্ন ভঙ্গি নিয়ে আঁকা ছবি ছিল মাত্র ১-টি। মুখোশ ও মুখ পর্যায়েও ছিল ১টি ছবি। মুখাবয়ব মুখ। বাকি সব নারীর। নারীমুখ তাঁকে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত টেনেছে। অবয়ব, অঙ্গভঙ্গি, জীবনের নানা বিচিত্র অভিব্যক্তি—এই পর্যায়ে কোনো ছবিই আঁকা হয় নি এই শেষ বছরে। নিসর্গের ছবি এঁকেছেন ১টি। পুলের ছবি ১টি। সব চেয়ে বেশি ছিল ড্রয়িং-ও ইলাস্ট্রেশন। মোট ৪৬টি।

এবারে আমরা একেবারে শেষ দিকের কয়েকটি ছবি একটু দেখে নি। চিত্রাবলীর শেষ ছবি কাগজের উপর প্যাস্টেলে আঁকা একটি ড্রয়িং। এঁকেছিলেন ২ জুন ১৯৪১ তারিখে। কালো প্যাস্টেলের আলুলায়িত বিস্রস্ত রেখার টানে গড়ে উঠেছে তিনটি মুখ। শুদ্ধ মুখ নয়। আবক্ষ শরীরের কিছু অংশও আছে। কিন্তু তিনটি শরীর আলাদাভাবে চিহ্নিত নয়। আবক্ষ শরীরের কিছু অংশও আছে। ছবিটি দেখলে বোঝা যায় খুব অভিজ্ঞ একজন শিল্পী অপরিকল্পতি ভঙ্গিতে তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশ করছেন রেখা জালিকার মধ্য দিয়ে। যে তিনটি মুখের আভাস দেখা যাচ্ছে তিনটিই বিষাদগ্রস্ত। যেন ভিতরেরও লেখা সভ্যতার সংকটে'র আবহকে মনে পড়িয়ে দেয়। ছবিটির বাঁ পাশে প্রায় মাঝামাঝি অংশে বাংলা হরফে কিছু লেখা আছে। রবি ঠাকুর স্বাক্ষরটি বোঝা যায়। তার উপর খুব অস্পষ্টভাবে লেখা, 'উত্থান পতন চলবে'। তার নীচে তারিখ দেওয়া ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮। ছবিটি দেখলে বোঝা যায় শরীর দুর্বল হলেও মনের ভিতর চলছে এক রহস্যলোকের আলোড়ন। এই তিনটি মুখ যেন মানবতার প্রতীক দুঃখের তিমিরে আবৃত।

ওই একই তারিখে এঁকেছিলেন আরো একটি ড্রয়িং। একই চিত্রপটে চারটি মুখের সমাহার ছিল সেখানে। কালো প্যাস্টেলের হালকা ছাতাতলে আঁকা। একটি নারীমুখ। মধ্যে আপাত কোনো সম্পর্ক নেই। অবসর যাপনের ফাঁকে খেলাচ্ছলে আঁকা এই মুখগলি। কেননা চিত্রপটের নীচের দিকে বাঁ-দিকের প্রান্ত ঘেঁষে লেখা রয়েছে 'বিছানায় চিৎপাত হয়ে ছেলেমানুষি করা গেল'। তার তলায় স্বাক্ষর রবি ঠাকুর। তারপর তারিখ। শেষ দুটি ছবিতেই একজন বিদগ্ধ শিল্পীর মানবিক বোধের পরিচয় থাকে।

ড্রয়িং -এর প্রসঙ্গই এল যখন, আমরা ড্রয়িংগুলোকেই দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি প্রথমে। শেষ থেকে শুরু করে একটু পিছিয়ে যেতে থাকি। 'চিত্রাবলী'-র পাতা ধরে জুন ১৯৪১ -এ আঁকা সেই ড্রয়িংটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে তারিখ লিখেছেন ১ আষাঢ়। অর্থাৎ ১৯৪১-এর ১৫ থেকে ১৭ জুনের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা। সেই অনুসারে এটিকেই বিবেচনা করা যায় তাঁর শেষ ছবি বলে। এর পরের কোনো ছবির দৃষ্টান্ত আপাতত আমাদের জানা নেই। এই ছবিটিকে দেখে মনে হয় তাঁর 'গল্পসল্প' -এর ইলাস্ট্রেশন। প্যাস্টেলে আঁকা একটি গাছ। তার সামনে একজন গ্রামীণ মানুষ। কৌতুকচ্ছলে আঁকা । খুবই সরস ছবি।

এই, ড্রয়িং -এর ধারাবাহিকতায় পিছিয়ে যেতে যেতে দুটি নারীমুখের ছবি আমাদের নজর কাড়ে। একটি ১৪.০৯.১৮৪০ তারিখেআঁকা পেন্সিল স্কেচ। অল্প রেখা। অনেকটা সাদা জমি ছেড়ে গড়ে উঠেছে ডিম্বাকৃতি মুখ। আয়ত চোখ। রহস্যময় লাবণ্যমাখা দৃষ্টি। বিদেশিনীর কথা মনে পড়ে। যে বিদেশিনী বার বার এসেছেন তাঁর ছবিতে, কবিতায় প্রায় একই সময়ে সেপ্টেম্বর ১৯৪০-এ এঁকেছিলেন আর একটি নারীমুখের ছবি কালি-কলম ও প্যাস্টেলে। এটি সম্পূর্ণ রাবীন্দ্রিক ঘরানার অন্ধকারলিপ্ত রহস্যময় মুখ। ঘনসংবদ্ধ আলম্ব রেখা আঁচড়ে গড়ে উঠেছে অন্ধকার, বাঁ-দিকের চোখ ও ঠোঁটের উপর আনা হয়েছে হাইলাইট বা আলোর উজ্জ্বলতা। আলো - অন্ধকারের অন্তর্মুখীনতা, রহস্যময়তা রবীন্দ্রনাথের ছবি বৈশিষ্ট্য। যা তাঁর আগে আমাদের ছবিতে ছিলনা। শেষ জীবন পর্যন্ত এই রহস্যময়তাকেই তিনি নানাভাবে পরিস্ফুট করেছেন। এই ছবিটি তার আদর্শ দৃষ্টান্ত।

১৯৪০ পর্বের ড্রয়িং ও স্কেচে এরকম নারীমুখ আরও অনেক এসেছে। নিসর্গ এবং অন্যান্য বিচিত্র বিষয়। 'গল্পসল্প' -এ ইলাস্ট্রেশনও এঁকেছেন অনেক। ড্রয়িং-এর বাইরে অন্যান্য পর্যায়ের ছবির সংখ্যা কমে গেছে। এবারে তারই কিছু দৃষ্টান্তের দিকে আমরা তাকবো।

ডুড্‌লস বা কাটাকুটি ছবি তিনি সারা জীবনই এঁকে গেছেন। ১৯৪০-৪১এর তিনটি ডুড্‌লস -এর মধ্যে শেষতমটি ৩.২.১৯৪১ -এ আঁকা।' 'আরোগ্য' -এর একটি কবিতার পান্ডুলিপি এটি। কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইন এরকম:

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে/ আতস বাজির খেলা আকাশে আকাশে/সূর্যতারা লয়ে/যুগ যুগান্তের পরিমাপে।/অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি/ ক্ষুদ্র অগ্নিগণ্যা নিয়ে এক প্রান্তে/ ক্ষুদ্র দেশে কালে' দেখছিলাম চাহি/ নির্বাপিত নক্ষত্রে নেপথ্য প্রাঙ্গণে/ নটরাজ নিজস্ব একাকী।' এই কতিাটিকে কাটাকুটি করে তিনি বের করে এনেছেন একটি স্রোতধারা। যা আলুলায়িত বিভঙ্গে উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে অথবা নীচ থেকে উপরে উঠে গেছে। আর উঠে যাওয়ার প্রতিটি বাঁকে ওড়ার গতিতে মুখ বাড়িয়ে আছে এক একটি পাখি। রহস্যময় রূপ। তা কবিতার সচিত্রকরণ বা ইলাস্ট্রেশন নয়। সমান্তরাল ও স্বতন্ত্র এক অভিব্যক্তি। কবিতা ও ছবিতে কবির বিশ্বচেতনা যে দুটি আলাদা পরিসর তৈরি করেছে সব সময়ই—এটি

তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত। ২৯.০৫.১৯৪০ তারিখে কালিম্পঙ্-এ আর একটি পাণ্ডুলিপিতে ছবির অভিনবত্ব তেমনভাবে পরিস্ফুট নয়। স্রোতধারার মতো রেখা গড়িয়ে গেছে উপর থেকে নীচে। এই স্রোতধারার ইঙ্গিত আছে কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইনে : 'মন যে তাহার হঠাৎ প্লাবনী/ নদীর প্রায়/ অভাবিত পথে সহসা কী টানে / বাঁকিয়া যায়।' শেষ বছরে এই তিনটিই তাঁর কাটাকুটির ছবি।

এ ছাড়া 'কম্পোজিটস ও প্যাটার্ন' পর্যায়ে রয়েছে একটি ছবি' ১৫.০৭.১৯৪০ তারিখে আঁকা। কাগজের উপর কালি-কলম ও প্যাস্টেলে। এই ছবিটিকে বলা যেতে পারে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবির অন্যতম। ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাচ্ছে একজন সন্তবেশি মানুষ। কালো ও রঙিন সরু রেখার জালিকায় গড়ে উঠেছে রূপ। অভিনবত্বে অসামান্য। রবীন্দ্রচিত্রের বিষয়বৈচিত্রও যে বহুবিস্তৃত, এই ছবিটি থেকে তা বোঝা যায়। আঙ্গিকের দিক থেকেও তাঁর অন্য ছবির তুলনায় এই ছবিটি ব্যতিক্রমী। বর্ণের ছায়াপাত নেই। শুধু রেখার জালিকা। তাতেই বের করে এনেছেন গাছপালাও বনানীর আবহ এবং ঘোড়া ও মানুষের অবয়ব। প্রকরণের বৈশিষ্ট্যে তারও প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। ঘোড়াটিকে তো আলাদা করে চিনে নেওয়াই কঠিন। সমস্তই যেন প্রকৃতিতে একাত্ম হয়ে গেছে। প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতাই হয়তো এই ছবিটির প্রধান উপজীব্য।

মুখোশ ও মুখ পর্যায়ে রয়েছে ১৬ এপ্রিল ১৯৪০ তারিখে আঁকা একটিই ছবি। কাগজের উপর রঙিন কালি দিয়ে আঁকা। আঙ্গিকের দিক থেকে এটি অভিনব। সরলরেখার কৌণিক বিন্যাসে ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের সমাহারে গড়ে উঠেছে সাত বাহু বিশিষ্ট একটি জ্যামিতিক ক্ষেত্র অনেকটা মৃৎপাত্রের মতো ঘট বা কলসির আকারের। তার ভিতর থেকেই বের করে এনেছেন চোখ, নাক ও মুখ। পুরুষের মুখ। কৌতুকপূর্ণ সরস দৃষ্টি। বাদামি রঙের ছায়াময়তার ভিতর সাদা ছেড়ে উজ্জ্বলভাবে বের করে এনেছেন চোখদুটি। এই শেষ বয়সেও তাঁর অনুভব যে কি বৈভবময় ছিল, এই ছবিটি তার দৃষ্টান্ত।

মুখাবয়ব ও চরিত্র বা পোট্রেট অ্যান্ড ক্যারেকটার বিভাগে ছিল ১২টি ছবি। আগে বলেছি, একটি বাদে বাকি সবই নারীমুখ। শেষ মুখাবয়বটি ২৩ চৈত্র ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের। প্যাস্টেলের রেখাতেই আঁকা। অবয়বের এক পাশটি সম্পূর্ণ সাদা। আর এক পাশে কালো রেখার ছায়াতপ। মাঝখানে ডিম্বাকৃতি শান্ত কোমল মুখটি। এরকমই প্রায় একই আঙ্গিকে ৫.৪.১৯৪০ -তারিখে আঁকা আর একটি মুখ। ৫.৫.১৯৪০ তারিখে আঁকা মুখটি গড়ে উঠেছে রেখার জালিকার মধ্য দিয়ে। এই রকম বিচিত্র ভঙ্গিতে শেষ বছরে তিনি এঁকে গেছেন মুখাবয়বগুলি। রহস্যময়ী নারী তাঁকে সারা জীবন তাড়িত করেছে।

এই শেষ পর্যায়ে নিসর্গচিত্র আছে মাত্র একটি, আর একটি ফুল! ৩.৮.১৯৪০ -এ আঁকা নিসর্গটিতে রয়েছে উচুনিচু জমিতে কিছু গাছের সারি কাগজের উপর কালি-কলমে আঁকা। রেখার জালিকার এরকম ব্যবহার আমরা সেই ঘোড়ার পিঠে সন্তরূপী মানুষের ছবিটিতে দেখেছি। এই প্রকরণটিকে তখন তিনি খুবই ব্যবহার করেছিলেন। ফুলের ছবিটিও এই একই প্রকরণে আঁকা। একই লতার উপর তিনটি ফুল। সম্মোহিত সৌন্দর্য।

জীবনের শেষ এক বছরে রবীন্দ্রনাথ এরকমই কিছু ছবি এঁকেছিলেন। সংখ্যা কমে এসেছে ঠিকই। কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞার আলোর প্রতিফলন কিছুমাত্র কমে নি। বরং সহাস্য কৌতুকদীপ্ত এক শিল্পীসত্তাকে পাওয়া যায় এর মধ্য দিয়ে। তাঁর ড্রয়িং ও ইলাস্ট্রেশনগুলি এদিক থেকে খুবই প্রাসঙ্গিক। এ ছাড়া মুখোশের ছবিটিতে রয়েছে ফর্মের নতুন উদ্ভাবনা। নারী মুখাবয়গুলির মধ্যে নারীর রহস্যের নিবিড় সন্ধান চলছে তখনও। এই সংবেদন বুঝিয়ে দেয়, যদিও ভঙ্গুর হয়ে এসেছে শরীরের সুস্থতা, তবু চৈতন্যের আলো ম্লান হয় নি এতটুকু। যে অন্তর্লীনতা, অন্তর্মুনতা রবীন্দ্রনাথের ছবির বৈশিষ্ট্য, নারী মুখাবয়গুলিতে এখনও রয়েছে তার সমৃদ্ধ উৎসারণ। রঙের ছবি এই পর্যায়ে যেহেতু কমে এসেছে, তাই দুটি গভীর বর্ণের মধ্যবর্তী সাদা ছেড়ে দিয়ে গড়ে তোলা আলোক রেখার, যাকে 'বিরেখা' বলা হয়ে থাকে তার সন্ধান এই পর্যায়ের ছবিতে খুব একটা পাই না। বা আঙ্গিকগত নতুন কোনো উদ্ভাবনাও তেমন কিছু নেই। কিন্তু তাঁর এত দিনের চিত্রভাবনার ও চর্চার যে অর্জন তার স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য সম্পূর্ণভাবেই উপস্থিথ তাঁর শে, এক বছরের ছবিতে। অনেক সহজ, সংবৃত, আত্মমগ্ন হয়ে উঠেছে তাঁর প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের শেষ গানটি ৬ মে ১৯৪১ -এর রচনা। 'হে নূতন/ দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।" এটি অবশ্য 'পূরবী'-র' পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির শেষ স্তবকের পুনর্লিখিত রূপ। এতে তিনি বলতে পেরেছিলেন : 'ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,/ ব্যাক্ত হোক তোমামাঝে অসীমের চিরবিস্ময়'। এর কুড়ি দিন আগে ১৪ এপ্রিল রচিত হয়েছিল 'ওই মহামানব আসে' গানটি। তার শেষ লাইন : 'জয় জয় জয় রে মানব - অভ্যুদয়' / মন্দ্রি -উঠিল মহাকাশে" জীবনের উপর মানুষের উপর এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁরা সারা জীবনের ছবিতে এই বিশ্বাসের সঙ্গে কিছু দ্বন্দ্বাকীর্ণ সংশয়ও মিশে ছিল। শেষ এক বছরের ছবিতে এই দ্বন্দ্বের ভিতরে থেকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বিশ্বাসের আলো।